বাংলাদেশেও সম্ভব

একটি সফল সেচ প্রকল্প

রিপোর্ট... **আসাদুর রহমান**
সহযোগিতায় **বদরুদ্দোজা রিপন**

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য থাকে মহৎ কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, দুর্নীতি, কর্মকর্তাদের উদাসীনতায় প্রকল্পগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তবে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম রয়েছে। মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প তারই একটি। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে প্রকল্পটি বর্তমানে সফলতার মুখ দেখেছে।

সফলতা পাওয়া এই সেচ প্রকল্পটি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলা চাঁদপুরের মতলব থানায় অবস্থিত। ১৭৫৮৪ হেক্টর এলাকায় বিস্তৃত এই প্রকল্পটি দেখতে একটা দ্বীপের মতো। দ্বীপটি উত্তর ও পশ্চিম দিক মেঘনা নদী এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিক ধনাগোদা (গোমতী নদী) নদী দ্বারা বেষ্টিত। প্রকল্পটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং সেচ– এই তিনটি কার্যক্রমের সমন্বিত রূপ। এই সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়ার পূর্বে প্রকল্প এলাকাটির বিরাট অংশ ২/৩ মিটার পানির নিচে তলিয়ে থাকতো। এবং সম্পূর্ণ এলাকায় কম বেশি বন্যা হতো। রবি ও অগ্রিম খারিফ মৌসুমে মাটির আর্দ্রতার ঘাটতি কৃষিক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতো। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিলো বন্যার পানি থেকে দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগ রক্ষা করা, জলাবদ্ধতা দূর করা এবং এর মাধ্যমে কৃষককে একাধিক ফসল ফলাতে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে বর্ষাকালে উচ্চ ফলনশীল আমনের আবাদ করা। উদ্দেশ্য ছিলো এই সেচ প্রকল্প প্রচলনের মাধ্যমে রবিশস্য এবং উচ্চ ফলনশীল বোরো চাষে কৃষক উৎসাহিত হবে।

প্রকল্পটির নকশা কৌশল হলো ৬০ কিলোমিটার রিং বাঁধ– যা সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা ঘিরে রেখেছে। অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে ২১ কি.মি খাল, ১২৬ কি.মি নালাপথ, ৬২টি নিষ্কাশন কাঠামো, ৭২টি ব্রিজ এবং ২টি পাম্প স্টেশন। ২টি বৃহৎ পাম্প মেশিন দিয়ে বর্ষা মৌসুমে পানি প্রকল্প এলাকার বাইরে ফেলা হতো। এর ফলে জনগণ বন্যা থেকে রক্ষা পেল, পাম্প দুটির অন্য একটি উদ্দেশ্য হলো শুষ্ক মৌসুমে নদী থেকে পানি তুলে প্রকল্পের খালে দেয়া। এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় ৫৪.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ ১৯৯৩/৯৪ অর্থ বছরে শেষ হয়ে যাবার কথা ছিলো। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ শেষ করা সম্ভব না হওয়ায় তা আরো কয়েকবছর ধরে চলতে থাকে।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক রিপোর্টে প্রকল্পটির বেশ কিছু সমস্যা তুলে ধরা হয়। বলা হয়, ২টি পাম্প স্টেশন প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। ফলে পানি-নির্মাণ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হবার পূর্বেই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাঁধ অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর কারণ ছিলো ২টি। সম্পূর্ণ নকশা প্রণয়নের সময় বাঁধের নকশা কৌশল ছোট করা হয়েছিলো এবং অধো মৃত্তিকার (Sub: soil) প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা হয়নি। বাঁধ নির্মাণের সময় খালগুলো গাদাগাদি করে কাটা হয়। মেঘনা তীরবর্তী হবার ফলে খালগুলো ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। এরপর বেশ কিছু বছর চলে গেলো। ৯৫/৯৬ সালে দেখা গেল প্রকল্প এলাকায় অনেকাংশেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু প্রকল্পের সম্পূর্ণ এলাকায় নির্ভরযোগ্য সেচ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এডিবির কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো। এডিবি সাহায্যের বিপরীতে কিছু শর্ত জুড়ে দিলো। এগুলো হলো– ১. সেচ এলাকার উন্নয়ন করতে হবে, ২. জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে, ৩. জনগণের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ নিতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে 'কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট' (CAD) নামক একটি বিনিয়োগ প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিলো ইতিপূর্বে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়িত পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৩০০০০ হেক্টর কমান্ড এলাকায় বিস্তৃত সেচ সুবিধাদির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ধরা হয় ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০১-২০০২ পর্যন্ত। CAD প্রকল্পের আওতায় ২০০১ সালের জুন মাসের মধ্যে মেঘনা-ধনাগোদা প্রকল্পের পূর্ত কাজ শেষ হয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে ১২২৯৬ হেক্টর (প্রায় ১০০%) সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফসলের বিজ্ঞানসম্মত ফলনবৃদ্ধিসহ কৃষিকাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ফলে জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে।

ভুল ছিলো প্রতিটি পরিকল্পনাতে

পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের ১টি ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতা পেতে এদেশের সময় লেগেছে ৪০ বছর। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের

আমলে উন্নয়নের জন্যে এ খাতে বারবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত কার্যক্রম পরিকল্পনাহীন হবার কারণে তা এদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশ ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পরপর ৩ বছর বড় ধরনের বন্যার কবলে পড়ে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বন্যার কারণ অনুসন্ধান করতে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর জন্যে জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানায়। জাতিসংঘ জে.এ.ক্রুগ-এর নেতৃত্বে একটি প্রযুক্তি সহায়তা দল পাঠায়। এই দলটি বন্যার কারণ সম্পর্কে ২টি বিষয় চিহ্নিত করে।

১. বন্যার কারণ সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা
২. দেশের বিপুল এলাকার সমতল ভূমি।

বিশেষজ্ঞ দলটি বিভিন্ন সুপারিশ দেয় যা এদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার পটভূমি তৈরি করে। সুপারিশের মধ্যে ছিলো বাঁধ নির্মাণ, বন্যার পানি নিষ্কাশন, বন্যা প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা, বন্যার পূর্বাভাস দেয়া, তিস্তা নদীতে ব্যারেজ নির্মাণ, ভারতের সঙ্গে মধ্যস্থতা ও সহযোগিতা, গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প এবং কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্রুত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

বিশেষজ্ঞ দলটি তাদের রিপোর্টে মূলত বৃহত্তর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার চেয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এটিতে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার ওপর পরিপূর্ণ কোনো সুপারিশ ছিলো না। কিন্তু রিপোর্টে বন্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা গ্রহণ, নকশা প্রণয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের জন্য এদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে।

১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর এদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে বছরই মহাপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়, সময়কাল ধরা হয় ২০ হতে ২৫ বছর। মহাপরিকল্পনায় তুলে ধরা হয় কৃষি উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম ব্যবস্থা– যা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (FCD) এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (FCDI) প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

মহা পরিকল্পনায় যে সব সুপারিশ তুলে ধরা হয় তার মধ্যে রয়েছে–

১. জল বিষয়ক উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ৪টি ভৌগোলিক ভাগে ভাগ করা

২. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ৫৯টি বড় FCD এবং FCDI প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৩. চাষযোগ্য ৮.৭৫ মিলিয়ন হেক্টর জমির মধ্যে ৪.৯ মিলিয়ন হেক্টর জমিকে বন্যামুক্তকরণ।

৪. মহাপরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে ৩.১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

৫. গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপর ব্যারেজ নির্মাণের পূর্ব সময় পর্যন্ত লো-লিফট পাম্প ব্যবহার করা।

দুঃখজনকভাবে ক্রুগ মিশন রিপোর্ট এবং মহাপরিকল্পনায় বৃহৎ পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়টিতে জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়, পরিবেশগত ও প্রতিষ্ঠানগত দিক এবং জনগণের সম্পৃক্ততার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। যেমন, শস্য উৎপাদন বেড়ে ওঠায় খরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু রিপোর্টগুলোতে তার কোনো উল্লেখ নেই। পরিবেশগত দিক হয়েছে উপেক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনায় নিজের একক কর্তৃত্ব রাখতে গিয়ে পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি এবং মৎস্য বিভাগকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে মহাপরিকল্পনা ঘোষণার ১ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাংক এর সমালোচনা করে। বিশ্বব্যাংক বলে পরবর্তী বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনার জন্যে এই মহাপরিকল্পনাকে একটি কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু একটি মহাপরিকল্পনার গাইড লাইন হিসেবে এর আরও পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের (IBRD) ভূমি ও পানি খাতের মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে পানি ও ভূমির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে কৃষি কৌশল গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেয়ে কৃষিকাজের উন্নয়নের কথা বলা হয়। রিপোর্টে বন্যা নিয়ন্ত্রণকে একটি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা,

CAD-এর সফলতার নেপথ্যে

কিভাবে এই সফলতা অর্জন সম্ভব হলো জানতে চাইলে CAD -এর পরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট) শরিফ রফিকুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, সেচ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে উপকার ভোগীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেসব সংগঠনই এখন প্রকল্পের পানি পরিচালনা ও সেচ ক্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে। সেচ সুবিধা থেকে একর প্রতি ৩৮০ টাকা করে সার্ভিস চার্জ আদায়ের মাধ্যমে উপকারভোগীদের প্রকল্পে অংশীদারিত্ব এবং স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি সফলতার মুখ দেখায় তারা বর্তমানে ১টি ফসলের জায়গায় ২টি অতিরিক্ত ফসল ঘরে তুলছে। তিনি বলেন, 'একজন কৃষক জমি সম্পর্কে অনেকের চেয়ে বেশি ধারণা রাখে। শুষ্ক মৌসুমে এদের কেউ কেউ মাটির নিচের পানি ব্যবহার করতো। কিন্তু সেই পানিতে আয়রন বেশি থাকে বলে তা মাটির উর্বরাশক্তি নষ্ট করে। অন্যদিকে নদীর পানিতে এসব অসুবিধা নেই। এটা কৃষকরা জানতো। তাছাড়া বোর্ডের সহায়তায় পানি প্রাপ্তিতে খরচও কম। তাই তারা সহজেই প্রকল্পের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করলো'।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ২০০২-এর বোরো মৌসুমে সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১ কোটি টাকা, এ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ১৮/২০ লাখ টাকা। অনেক কৃষক এ বছর তাদের চার্জ দিতে পারছে না। তবে তারা কথা দিয়েছে পরবর্তী বছরে বকেয়া সার্ভিস চার্জ শোধ করবে।

CAD প্রকল্পটি সফল হওয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মহিলাদের সম্পৃক্ততা। প্রকল্পের সার্বিক উন্নয়নে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষুদ্র মৎস্য চাষে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর ফলে মহিলারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

পানি নিষ্কাশন এবং সেচ পরিকল্পনার বিষয়টি আলোচনা করা হয়। 'বন্যার সঙ্গে মিলিয়ে চলা' ধারণাটি এই রিপোর্টে পরোক্ষভাবে অনুমোদন লাভ করে।

১৯৬৪ সালের মহাপরিকল্পনায় সময়কাল ছিলো ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকার UNDP ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে একটি জাতীয় পানি পরিকল্পনা নীতি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিলো একটি মহা পানি পরিকল্পনা তৈরি করা যার ফলে বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশে প্রতিষ্ঠা হয় একটি মহাপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৮৭ ও ১৯৯০ সালে দুই পর্যায়ে কাজটি শেষ হয়।

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা কাজ চালানো হয়। এ দেশের আগামী দিনের বন্যা ব্যবস্থাপনা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপি পরিচালিত গবেষণা থেকে ১৯টি গাইড লাইন বের হয়ে আসে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ২৭টি গবেষণা কাজ চালানো হয়। এই গবেষণাগুলো থেকে একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যপরিকল্পনা (FAP) গঠন করা হয়।

FAP-এর কার্যক্রমের মধ্যে পরিবেশগত দিক ও জনগণের অংশগ্রহণের বিষয় উল্লেখিত ছিলো। তাছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক দিকও এখানে আলোচনা করা হয়। তবুও এটি সমালোচনার মুখে পড়ে। কারণ পানি ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহারে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের বিষয়টি এখানে আলোচনায় আসেনি। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকগুলো এখানে তুলে ধরা হয়নি।

সফল বাস্তবায়নের অন্তরায় সমূহ

ধারাবাহিকভাবে চলে আসা পরিকল্পনা প্রণয়নে সমস্যার জন্য এ দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পগুলো তেমন কোনো সফলতার মুখ দেখেনি। অধিকাংশ প্রকল্পর সফলতা ৫০ ভাগেরও নিচে। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই, সম্ভাব্যতা যাচাই, নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ কাঠামো এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। ফলে এই প্রকল্প থেকে পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া পরিকল্পনা ও নকশা তৈরির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য পর্যাপ্ত ছিলো না। প্রকল্প উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি এবং কিভাবে বিকল্প ফসল উৎপাদন করা সম্ভব সেটাও আলোচনা করা হয়নি। যার ফলে প্রকল্প এলাকার জনগণ প্রকল্পের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেনি।

ঠাকুরগাঁওয়ে অবস্থিত টাংগুন বাঁধ প্রকল্পের সমস্যা সম্পর্কে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক (প্রকল্প মূল্যায়ন) মোরশেদ আহমদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ঠাকুরগাঁওয়ে রয়েছে সংগঠন সমস্যা। যেমন : পরিকল্পনায় ছিলো শ্যালো টিউবওয়েল ব্যবহার করা হবে। কিন্তু পরে ডিপ টিউবওয়েল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়– যা ছিলো খুবই ব্যয়বহুল। কৃষকরা উচ্চ হারে সার্ভিস চার্জ দিতে পারলো না। ফলে গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালিত এই প্রকল্পটি সফলতা পেল না'। তিনি বলেন, 'কিছু সাধারণ সমস্যা সব প্রকল্পেই রয়েছে। যেমন ফান্ড সংগ্রহে সমস্যা, সময় মতো সেই টাকা হাতে পাওয়ার সমস্যা, সময় মতো সেই টাকা নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারে সমস্যা। এর পর রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ সমস্যা। এ ছাড়াও রয়েছে জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি। যার জন্য প্রজেক্ট তার সঙ্গেই কোনো আলোচনা নেই, জনগণ কি চাচ্ছে, তারা কি সেচ চাচ্ছে, নাকি বন্যা নিয়ন্ত্রণ চাচ্ছে, নাকি পানি নিষ্কাশন চাচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়াল নেই'। সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ প্রসঙ্গে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'প্রকল্পের খরচ উঠিয়ে আনার জন্য এখন যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। এতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ উঠিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর জন্যে সুবিধাভোগীদের চাপ দিতে হবে। মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের ম্যাজেস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।

সফলতার জন্য করণীয়

বর্তমানে দেশের ৪.৬০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এই পরিমাণ মোট কৃষি জমির ৫৫% এবং সেচযোগ্য জমির ৬০%। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ২৫টি বৃহৎ ও মাঝারি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এবং ১৫৭টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে মোট ১.১৬ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। বাকিটুকু চলছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিমালিকানায়। আর মোট কৃষি জমির ৪৫% সেচ সুবিধার বাইরে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সেচ প্রকৌশলী এস.এ.এম রফিকুজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কোনো বিষয়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থাকলে বিশ্বব্যাংক তাতে টাকা দেয়। বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পানি নিয়ে কোনো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেই। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, টেলিফোনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পানিকে রেখেছে ৮ নম্বরে। তবে কিভাবে এ দেশের সরকারি সেচ এলাকা বৃদ্ধি পাবে। সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মোট জমির ৯২% জমি সাধারণ চাষীরা নিজের উদ্যোগে করে যাচ্ছে। পানি থেকে তেল কেনা সব কাজ তারা করছে। বিদ্যুৎ না থাকলে সরকারি সম্পদ বন্ধ থাকে। পাম্প একবার নষ্ট হলে তা ঠিক করতে কয়েকদিন সময় লেগে যায়। তাই কৃষকরা ঝুঁকি নিতে চায় না।

আমাদের এই সেচ প্রকল্পগুলো কিভাবে সফল করা সম্ভব প্রশ্ন করা হলে কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক নিত্যনন্দন চক্রবর্তী সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'প্রকল্প পরিকল্পনার সময় শুধু টেকনিক্যাল নয়, অন্য সব দিক খেয়াল রাখতে হবে। প্রকল্প 'সাইকেল' চিহ্নিত করতে হবে। কি করবেন, কোনটি অগ্রাধিকার পাবে, পানিপ্রাপ্তি কোথায় সহজ হবে, কোথায় সেচের চাহিদা বেশি এই বিষয়গুলো পরিকল্পনা তৈরির পূর্বে খুঁজে বের করতে হবে। এরপর জনগণ, আর্থিক ও প্রকৌশলিক সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। বিস্তারিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, Land level-এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এরপর আসবে জনগণের অংশগ্রহণের দিকটি। জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো যেমন ক্লাব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মক্তব এগুলো প্রকল্প কাজের জন্য অনুকূল না প্রতিকূল তা যাচাই করতে হবে। তারা এই প্রকল্প চায় কি না বা কিভাবে চায় সেটা খুঁজে বের করতে হবে। এরপর আসবে বিস্তারিত প্রকৌশলগত দিক। কোথায় পাম্প বসাতে হবে, কতগুলো পাম্প বসাতে হবে, কিভাবে নালা তৈরি করতে হবে, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা কি হবে তা বের করতে হবে। তবেই একটি সফল সেচ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব'।